Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লোকসাহিত্য ও ফোকলোর-চর্চা

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.1
Pages	১-৩০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লোকসাহিত্য ও ফোকলোর-চর্চা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ*

সারসংক্ষেপ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ধারায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অবস্থান কালজয়ী। এক বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনাসহ বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। গবেষণা-গ্রন্থের পাশাপাশি তিনি বেশকিছু মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। বাংলা লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন ও চর্চায় তাঁর অনুরাগ ছিল ব্যাপক। এই প্রবন্ধে বাংলা লোকসাহিত্য ও ফোকলোর-চর্চায় তাঁর ব্যাপক অবদান ও আগ্রহের তথ্যসূত্র উপস্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দীর্ঘ কর্মময় জীবন কেটেছে ভারতীয় উপমহাদেশের ভাঙাগড়ার কালের মধ্যে[১]। তাঁর জন্মের বছরেই যাত্রা শুরু করেছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান সংস্থা কংগ্রেস। পরের দশকে গঠিত হয়েছিল বাঙালির জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। তাঁর স্কুলজীবনের শেষদিকে একদিকে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গ; রদ্ হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি অর্জনের বছরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের কালে। তাঁর জ্ঞানচর্চার প্রধান পর্বটিতে ঘটেছে ভয়াবহ দাঙ্গা ও ভারত বিভাগ। বিভাগোত্তরকালে তিনি যখন পূর্ব বাংলার চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রধান, তখন এ ভূখণ্ডের মানুষ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার অর্জনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এসবের মধ্যে এবং এসবকে সঙ্গী করেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হয়ে উঠেছিলেন জ্ঞানতাপস।

শহীদুল্লাহ্‌র জন্ম (১৮৮৫) কলকাতার অদূরবর্তী বশিরহাটে। এন্ট্রান্স পাশ পর্যন্ত লেখাপড়া হাওড়া স্কুলে (১৮৯৬-১৯০০)। এফ.এ. কলকাতা মাদ্রাসার মাধ্যমে (১৯০৪-০৬) প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। অল্পসময় হুগলি কলেজে পড়ার পর

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিছুদিন যশোর জেলা স্কুলে শিক্ষকতা (১৯০৮-১৯০৯) করেছেন। পরে ব্রাহ্ম প্রভাবিত সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. (১৯০৯-১০) অর্জন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম.এ. পড়তে চেয়েছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো উপাচার্যও মুসলমানকে বেদ পড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণ শিক্ষককে রাজি করাতে পারেননি। ফলে নতুন বিভাগ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ভর্তি হয়ে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন (১৯১১-১২)। গবেষণার জন্য জার্মানিতে বৃত্তি পেয়েছিলেন (১৯১৩); স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখিয়ে সরকার যাবার অনুমতি দেয়নি।

এসময়ে শহীদুল্লাহ্ আইনে ডিগ্রি নেন (১৯১৪)। তবে প্রথমে পেশা হিসেবে বেছে নিলেন শিক্ষকতা – চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯১৪-১৫)। বি.এল.- কে Bad Livlihood মনে করলেও বাধ্য হয়ে কিছুদিন আইন ব্যবসা করেন বশিরহাটে (১৯১৫-১৯)। সঙ্গে বশিরহাট পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান। এ বছরেই তাঁর জীবন ঠিক পথে বাঁক নিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন শরৎকুমার লাহিড়ি গবেষণা-সহায়ক পদে (১৯১৯-২১)। আশুতোষ বুঝতে পেরেছিলেন ওকালতি শহীদুল্লাহ্‌র কাজ নয়, তাঁর জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ে[২]। দীনেশ চন্দ্র সেনের সঙ্গে গবেষণার কাজ শুরু করলেন শহীদুল্লাহ্।

তখন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের খুশি করতে ইংরেজ শাসকরা গড়ে তুলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে আবেদন করলেন শহীদুল্লাহ্ এবং নিয়োগ পেয়ে এপদে যোগ দিলেন (২ জুন ১৯২১)। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও দীনেশ চন্দ্র সেন দুজনেই তাঁকে কলকাতায় থেকে যেতে বলেছিলেন। অন্যদিকে ঢাকায় অপরিচিত বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শুরুতে তাঁকে শিক্ষক করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না[৩]। পরে অবশ্য শহীদুল্লাহ্ শাস্ত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়েছিলেন। ১৯৩৭-এ দায়িত্ব নিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের; এর সাত বছর পর প্রথম অবসর (জুন ১৯৪৪)। কিন্তু ভারত-বিভাগের কালে বাংলার অধিকাংশ শিক্ষক ঢাকা ত্যাগ করলে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে আবার ফিরে এলেন বিভাগে (১৯৪৮); নিলেন অধ্যক্ষের দায়িত্ব (১৯৫১-১৯৫৪)। ছয় বছর পর আবার অবসর (জুন ১৯৫৪)। ১৯৬৭ সালে তাঁকে বাংলা বিভাগের এমেরিটাস প্রফেসর করা হয়। মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৬৯) আনন্দের সঙ্গে এপদে ছিলেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম এমেরিটাস অধ্যাপক। বাংলা বিভাগ মূলত তাঁর হাতে গড়া। এর পাঠদানে চর্যা ও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি তাঁর বিশেষ অবদান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রদের পাঠদানে শ্রেণিকক্ষের বাইরে আবাসিক শিক্ষকদেরও তৎপরতা ছিল। শহীদুল্লাহ্ কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (১৯২০-২১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের

আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্ব নেন তিনি (১৯২১-২৫, ১৯২৮-৩০) : এর মধ্যে দুবারে তিন বছর প্রভোস্টের দায়িত্বও পালন করেন। ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রথম প্রভোস্ট হন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৪০-৪৪)। এ ছাড়াও আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন; কলা অনুষদের ডিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদ ও কোর্টের[৪] সদস্য ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এর একটি বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪৪-৪৮)। এখানে চার বছর কাজ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকে প্রথমে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে ও পরে স্থায়ীভাবে ফিরে আসেন। এর মধ্যে ১৯৪৫ সালে একবার কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদ ও আবেস্তার অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন [দ্র. আবেদনপত্র, আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৯৩]। রাজশাহীতে পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে শহীদুল্লাহ্ এর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব নেন (১৯৫৫-৫৮)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ গড়ে উঠেছিল শহীদুল্লাহ্‌র হাতেই।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের জন্য একটি একাডেমির অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের অধিবেশনে Bengali Academy-র প্রস্তাব গ্রহণের পর ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে সিল্‌হেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মঞ্চে "বাংলা সাহিত্য নিকেতনের" যে রূপরেখা তিনি দিয়েছিলেন তার "দ্বিতল গৃহ", "গ্রন্থাগার ও পুঁথিশালা", 'অনুবাদ বিভাগ", "পুস্তক প্রকাশ বিভাগ", "গবেষণা প্রকোষ্ঠ" প্রভৃতি পরবর্তী সময়ের বাংলা একাডেমির রূপকেই ফুটিয়ে তোলে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪: ৫৭৯]। এর আগে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতির ভাষণে একই ধরনের প্রস্তাবে তিনি "একাডেমী" শব্দটিও ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৬০-এর দশকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ "অস্থায়ী কর্মচারী" হিসেবে বাংলা একাডেমিতে যোগ দেন। অবসর নেন ১৯৬৭ সালের ১লা এপ্রিল। বর্ধমান হাউজের নিচতলার শেষ কোনার কক্ষটিতে বসে শহীদুল্লাহ্ সংকলন করেছিলেন *পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। তাঁর সম্পাদিত এই অভিধান বাংলা অভিধান-চর্চায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করে যা বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতা পূরণ করেছিল। একাডেমিতে তার দ্বিতীয় কাজ ছিল ইসলামি বিশ্বকোষ তৈরি। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে শহীদুল্লাহ্ এর পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করলেও ইসলামী একাডেমী (বর্তমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন) থেকে অনেক পরে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রধান পরিচয় জ্ঞানতাপস। ৩৪ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশ চন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে যে জ্ঞানচর্চা শুরু করেছিলেন, পরবর্তী

অর্ধশতক তাতে কোনো ছেদ পড়েনি। প্যারিসের প্রাচীন সর্‌বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছিলেন প্রাচীন চর্যাকার সরহ ও কাহ্নের পদ নিয়ে গবেষণা *(Les Chants Mystiques de Kanna etde Saraha)* করে DOTEUR DE L' UNIVERSITY ডিগ্রি পান। ধ্বনিতত্ত্বে গবেষণার জন্য পান Dip. Phon ডিগ্রি। বস্তুত বৃহত্তর বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য উপকরণ চর্যাপদের চর্চা ও পাঠদানে শহীদুল্লাহ্ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯২০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেই চর্যাপদ পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর শিক্ষক নিয়ে প্রশ্ন তুললে শহীদুল্লাহ্ বলেন 'আমি পড়াব' [মুহম্মদ আবদুল হাই]। শাস্ত্রীর *চর্যাপদ* প্রকাশের পর এর পাঠ নির্ণয় , কবিদের কাল ও ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয় , শহীদুল্লাহ্ই প্রথম তার সমাধানের সূত্র দেন। চর্যার যে মোটামুটি শুদ্ধপাঠ বর্তমানে প্রচলিত তা অনেকাংশে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ , সুকুমার সেন ও প্রবোধকুমার বাগচীর অবদান। সেই ১৯২৬ সালেই *The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)*-এর পাতায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি 'obscure' শব্দের পাঠোদ্ধার ও চর্যার শুদ্ধপাঠ তৈরির জন্য শহীদুল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছিলেন [Suniti Kumar Chatterji 1926 : 118]।

মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নাথসাহিত্য ও ধর্মমঙ্গল, আলাওল প্রমুখকে নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ এখনও সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাদের প্রধান সহায়। ভাষাতত্ত্ব, বিশেষত ধ্বনিতত্ত্বে গবেষণা শুরু করেছিলেন প্যারিসেই (La sons du Bengalie)। বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে তাঁর "গৌড়ী প্রাকৃত হইতে উদ্ভব" তত্ত্ব যুগান্তকারী। ইতঃপূর্বে জর্জ গ্রিয়ারসন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাকে মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত বলে মত দেন। শহীদুল্লাহ্ এই মত খণ্ডন করে দাবি করেন যে বাংলা ভাষা গৌড়ী প্রাকৃত থেকে সৃষ্ট এবং এই ভাষার উদ্ভব দশম শতকে নয়, সপ্তম শতকে [দ্র. *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ১৯৬৫]। আনিসুজ্জামানের বিবেচনায় সুকুমার সেন ও সুখময় মুখোপাধ্যায় এই কাল বিবেচনা অনেকটা মেনে নিয়েছিলেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : সাত] সুনীতিকুমারও মাগধী ও গৌড়ীর বিতর্কে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণ রচনায়ও তিনি পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং তাঁর ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণচর্চার প্রশংসা করেছিলেন[৫]। বস্তুত ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার মধ্যে তিনি বাঙালির শিকড়ের সন্ধান করেছিলেন।

প্যারিসে তাঁর গবেষণার কাজ ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য (অক্টোবর ১৯২৬ - জুলাই ১৯২৮)। জুল্‌স ব্লকসহ তিনজন অধ্যাপকের অধীনে কয়েকটি নতুন ভাষা ও সাহিত্য তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। অভিসন্দর্ভের পুরো পাণ্ডুলিপিও তৈরি করতে হয়েছিল নিজের হাতে টাইপ করে। প্যারিস থেকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "কলেজের পড়াশুনা শেষ করিয়াও ছাত্র ছিলাম। কিন্তু আজকাল একেবারে পুরাদস্তুর

নাম লেখান ছাত্র" [দ্র. 'প্যারীর পত্র'; আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৩৮]। কলম্বো, ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, সুয়েজ খাল হয়ে প্যারিস যাত্রার পথটাও ছিল দীর্ঘ। তবে ভার্সাই, লন্ডন বা পম্পেই নগরী ভ্রমণ হয়তো তাঁর ক্লান্তি কিছুটা হ্রাস করেছিল। উপরি হিসেবে ছিল প্যারিসে ছুটির সময়ে জার্মানির ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ই. লিওম্যানের অধীনে অধ্যয়ন।

বহুভাষাবিদ হিসেবে তিনি কিংবদন্তি। জীবনের শেষপ্রান্তে *দিলরুবা*-য় প্রকাশিত (পৌষ, ১৩৬৭) 'আমার সাহিত্যিক জীবন' শীর্ষক স্মৃতিচারণে শহীদুল্লাহ্‌ লিখেছেন [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ২১]:

> স্কুলের মৌলভী সাহেবের ভয়ে ফারসী না নিয়ে সংস্কৃত নিয়েছিলাম। কাজেই স্কুলে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল। কিন্তু আমি ঘরে বসে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। গ্রীক ও তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম এই স্কুল জীবনেই ভাষা শিক্ষা আমার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষা-শিক্ষার দ্বিতীয় পর্বটি ছিল প্যারিসে। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিকী সম্পাদককে এক পত্রে তিনি জানান [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৩৮] :

> আমাকে আমার Thesis উপলক্ষে বাংলা ব্যতীত আসামী, উড়িয়া, মৈথেলী, পূরবীয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠা, সিন্ধী, লাহিন্দা, কাশ্মিরী, নেপালী, সিংহলী ও মালদ্বীপি ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। ... তিব্বতীও শিখিতেছি।

সঙ্গে তো ফরাসি ছিলই। অন্য এক আবেদনপত্র থেকে জানা যায় তিনি বৈদিক, হিব্রু, উর্দু, আরবি, জার্মান ও পশতু ভাষাও শিখেছিলেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৯৫]। এই ভাষা দক্ষতার প্রকাশ দেখা যায় তার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়। এই বহু ভাষাজ্ঞান অভিধান প্রণয়নেও সহায়ক হয়েছিল।

ফোকলোর ও লোকসাহিত্যচর্চার গুরুত্ব অনুধাবন ও তাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা শহীদুল্লাহ্‌র কর্মজীবনের আর একটি বিশিষ্ট মাত্রা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন গবেষণা-সহায়ক, দীনেশ চন্দ্র সেন তখন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করছেন। ১৯২০-এর দশকে ঢাকায় 'শিখা' গোষ্ঠীর চেয়ে তাঁর বেশি যোগ ছিল পূর্ববঙ্গ-সাহিত্য সমাজের। এ প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে পুথি ও লোকসাহিত্যের নিদর্শন সংগ্রহ [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : সাত]। পরের দশকের শেষ দিকে (১৯৩৮) আশুতোষ ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাংলা বিভাগে গঠন করেন লোকসাহিত্য সংগ্রহ সমিতি। পরের অর্ধযুগে বেশ কয়েকজন সংগ্রাহক নিয়োগ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাংলা বিভাগের

অধ্যক্ষের দায়িত্ব তিরিশের দশকের শেষ দিকে নিয়ে তিনি *মৈমনসিংহ গীতিকা*-কে অনার্স পর্যায়ে পাঠ্য করেন, যা তখন ছিল প্রায় অভাবিত। ১৯৫০-এর দশকে বাংলা একাডেমির লোকসাহিত্য সংগ্রহের যে বিপুল আয়োজন, তার অন্যতম প্রস্তাবক ছিলেন শহীদুল্লাহ্। লোকসাহিত্যের চর্চা সম্পর্কে তাঁর অনুভব: "আমাদের আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়বাংলা ঘর তুলতে" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৬]। শহীদুল্লাহ্ নিজে লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গীতিকা, প্রভৃতির সাহিত্যমূল্য, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস মিলিয়ে নতুন বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে এই ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সাহিত্যের উপকরণে হিন্দু ও মুসলমানের ভেদ না মানলেও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তৎকালে বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ও *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*-র যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ৩২ কলেজ স্ট্রীটের সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে তিনি নিয়মিত কাজ করতেন এবং ফিয়ার্স লেনে মেডিকেল ছাত্রাবাসের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত এই কার্যালয়েই বাস করতেন [মাহবুবুল হক ২০১০ : ৯]। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর এই কার্যালয়েই ঘনিষ্ঠতা হয়[৬]। শহীদুল্লাহ্ একাধিকবার বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গ্রন্থাবলি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন[৭]। আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের মধ্যে প্রকারভেদকেও তিনি স্বাভাবিক মনে করতেন[৮]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ "বিশ্বভারতীকে সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ প্রায় সমাধা" করে শহীদুল্লাহ্‌কে "ইহার সংসদের সদস্যরূপে বরণ" করার ইচ্ছা জানান এক পত্রে [২৯ বৈশাখ ১৩২১ দ্র ভূঁইয়া ইকবাল ১৯৮৫ : ১৫] কিন্তু নানা অসুবিধার কথা ভেবে শহীদুল্লাহ্ তখন সেটি গ্রহণ করেননি। তবে ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। আরও আগে (অক্টোবর ১৯২১) পুজোর ছুটিতে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে সাক্ষাৎ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। অনেক পরে ১৯৩৮ সালে মুহম্মদ আবদুল হাইসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্পর্ক পরিষদ (ICCR) শহীদুল্লাহ্‌কে সম্মানসূচক ফেলো করেছিল পরে; পাকিস্তান সরকার সেটি তাঁকে গ্রহণ করতে দেয়নি।

সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধারায় শহীদুল্লাহ্‌র অবদান কবিতা এবং অনুবাদ। তবে 'শৌখিন' সাহিত্যচর্চায় তাঁর সায় ছিল না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও (১৯৬৪) অনুভব

করেন, "সাহিত্যে যতই আনন্দ-উদ্দাম ও প্রকৃতি নিখুঁত থাকুক, তা অর্থহীন যদি তাতে জাতির অভাব মোচন না হয়" [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ৬৩]। ফলে নিজেকে রাজনীতির মানুষ নন বলে ঘোষণা করলেও জাতির ক্রান্তিলগ্নে তিনি একাধিকবার রাজনীতিকদের পথপ্রদর্শক হয়েছেন।

এর সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায় আমাদের ভাষা-আন্দোলনের সময়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগের মাসে (জুলাই ১৯৪৭) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। ভারত-বিভাগের আগের সপ্তায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর প্রতিবাদ করেন এই বলে যে [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ৪৯] "there will be no question of having any other language than Bengali as state language. To surrender Bengali to Urdu or Hindi... will be a shameful surrender of Bengal to outsider which will be as bad as, if not worse, than political subjugation"। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শহীদুল্লাহ্ আপসহীন ছিলেন। রাজনীতির মানুষ না হয়েও বগুড়ায় অংশ নিয়েছিলেন ১৯৪৮-এর মার্চে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর (৩১.৩.৫২) এক শিক্ষক সম্মেলনে উপস্থিতদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সভায় এসেছেন এবং উক্ত সভাটি রাজনৈতিক সমাবেশ না হলেও এর আলোচনায় ছাত্রদের ওপর এই নির্যাতনের প্রসঙ্গে তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারেন না [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ৫৬] ।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র অনুধাবন এবং এর প্রতিরোধে তাঁর সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বাঙালি জাতিকে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি তাঁর মন্তব্য:

> হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম, স্বাধীনতার নূতন নেশা আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় আরবী ও ফারসী শব্দের আমদানী, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসেছে।

তবে তিনি এই আশার বাণীও শুনিয়েছিলেন যে, "গায়ের জোর বা আইনের জোরে রাতারাতি" এ-ধরনের পরিবর্তন করতে চাইলে তা সফল হবে না। কেননা ভাষা রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী বদলায় না; বদলায় ভাষাতত্ত্বের নিয়মে" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৮৫]।

শহীদুল্লাহ্ বিশ্বাস করতেন, প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যন্ত সকল শিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। সেই ১৯১৭ সালেই তিনি অনুভব করেছিলেন "বিদেশী ভাষার সাহায্যে

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টিছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না" [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ৩৬]। অথচ এরকমের একটি উদ্ভট ব্যবস্থা নানা যুক্তি দেখিয়ে আমাদের দেশে এখনও টিকিয়ে রাখা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পরে (ডিসেম্বর ১৯৪৭) 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' নিবন্ধে তার বক্তব্য আরও স্পষ্ট [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ২২১] :

> ... প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাঙ্গালা হইবে। ইহা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না।

১৯৫১ সালে কুমিল্লার শিক্ষক সম্মেলনে পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম বাংলা না করা হলে প্রতিরোধের আহ্বান জানান শহীদুল্লাহ্ [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ১৯৯৪ : ৫৫]। ১৯৫৩ সালে সিল্‌হটে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে তাঁর দাবি, "...শিক্ষার বাহন যে মাতৃভাষা হইবে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারকে প্রথমেই স্বীকার করিতে হইবে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৮৪]। এরও দশ বছর পর (১৯৬১) রাইটার্স গিল্‌ডের আলোচনায় প্রশ্ন করেন, "রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের সহিত ভাষার পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভব?... ভাষা প্রাকৃতিক নিয়মে চলে" [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ৮৭] ।

ধর্মপ্রাণ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও চর্চার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত মনে করা যেতে পারে। ১৯২৬ সালে বাংলা অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যখন ভয়াবহ রূপ নেয় তখন তিনি প্যারিসে। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই সলিমুল্লাহ হল বার্ষিকীর সম্পাদককে তিনি লেখেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৩৯] ।:

> আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান উভয়ই পাগল হইয়াছে। কথামালায় পড়িয়াছিলাম, একজন একটি ঘোড়া ভাড়া করিয়াছিল। দুপুরের রৌদ্রের সময় সে ঘোড়ার ছায়ায় নামিল, ঘোড়ার মালিক বলিল "এ ছায়া আমার, তুমি ঘোড়া ভাড়া করিয়াছ, ছায়া ভাড়া কর নাই"। তখন ছায়ার অধিকার লইয়া দুইজনের মধ্যে তুমুল বচসা বাধিয়া গেল। শেষে হাতাহাতি। এই অবসরে ঘোড়া যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহা কেহই জানিল না। বাস্তবিক মসজিদের সামনে বাজনা বাজান কি না বাজান, ছায়া লইয়া মারামারি। ...আমি মনে করি, মুসলমানেরাই মসজিদের অবমাননা করিতেছে।

দেশে ফিরে কলকাতায় মুসলমান যুবকদের এক সম্মেলনে (১৯২৮) প্রশ্ন করেছিলেন "ক্ষুদ্র স্বার্থ Communalism সেখানে [যুবকদের মধ্যে] ঠাঁই পাবে কেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৩৮]। তিন দশকের দাঙ্গা এবং বহু-পরিচিত মানুষের মৃত্যু ও বিপর্যয় শহীদুল্লাহ্‌র মনোভাবে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে ডিসেম্বরের

শেষ দিনে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর বিখ্যাত উক্তি [আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ ২০০৮ : ৫৩] :

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী ।...মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপী-লুঙ্গী-দাঁড়িতে ঢাকবার জোটি নেই ।

এই সমন্বয়বাদ ধর্মাচার ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরাজমান বিভ্রান্তিকে দূর করতে পারে। প্রসঙ্গত মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং নিজ ধর্মের আচার পালনে ও প্রচারে শহীদুল্লাহ্ খ্যাতিমান ছিলেন।

দেশ-বিভাগের পর বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের হিন্দু-লেখক বলে তাঁদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি-প্রচারণা শুরু হলে শহীদুল্লাহ্ এর প্রতিবাদ করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনীতে তাঁর বক্তব্য [আ.জা.ম. তকীয়ুল্লাহ ২০০৮ : ৬০] :

> বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ সমালোচনা, এমন কি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলো ।

অনেক বিশ্লেষক হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ হিসেবে মুসলমান চাষিদের ওপর হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারকে চিহ্নিত করে থাকেন। ১৯২০-এর দশকে প্যারিস বাসকালে অন্নদাশংকর রায়ের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা হয়েছিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র। অন্নদাশংকর জানাচ্ছেন [অন্নদাশংকর রায় ১৯৮৫] :

> তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন চাষীরা কেন জমিদারী ব্যবস্থায় সুখী না। ... কিন্তু একবারও তিনি আমাকে এমন ইঙ্গিত দেন নি যে চাষীরা মুসলমান বলে তিনি তাদের জন্য চিন্তাকুল ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঐতিহ্য সন্ধানী ছিলেন, ছিলেন ঐতিহ্যের ধারকও। কিন্তু ঐতিহ্যকে আধুনিকতার প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করাননি। এর বড় উদাহরণ বাংলা ক্যালেন্ডারের সংস্কার, যাতে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখেই আধুনিক দিনপঞ্জির সন্নিবেশ ঘটেছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অক্ষয় কীর্তি তার গবেষণামূলক নিবন্ধগুলো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থি তিনি উন্মোচন করেছেন যা পরে তাঁর *বাংলা সাহিত্যের কথা*-র দুখণ্ডে স্থান পেয়েছে (১৯৫৩, ১৯৬৪)। এ ধরনের অন্য কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে *ভাষা ও সাহিত্য* (১৯৩১) গ্রন্থে। তাঁর *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*

(১৯৫৯) বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা নিবন্ধের সংকলন। ভাষা, শিক্ষা ও লিপি বিষয়ে তাঁর মতামত পাওয়া যায় *আমাদের সমস্যা* (১৯৪৯) গ্রন্থে। তাঁর চর্যার পাঠালোচনা ও চর্যা-চিন্তার ফসল *Buddhist Mystic Songs* (১৯৬০) চর্যা-গবেষণায় অপরিহার্য উপকরণ। শহীদুল্লাহ্ উর্দু ও ফারসি থেকে হাফিজ, উমর খয়্যাম, ইকবাল প্রমুখের কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। নীতিশিক্ষামূলক কয়েকটি গল্পও রচনা করেছিলেন যা *রকমারী* (১৯৩২) সহ নানা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাকরণসহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। ইসলাম ধর্মের নানা প্রসঙ্গ এবং রসুলের জীবন ও কর্ম নিয়েও শহীদুল্লাহ্‌র বেশ কিছু রচনা রয়েছে। কোরানের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ করেছিলেন তিনি, যা এখনও অপ্রকাশিত। *আঙ্গুর* নামে একটি শিশু মাসিকও তিনি সম্পাদনা করেছিলেন (১৯২০)

তাঁর মনন ও পাণ্ডিত্য দীর্ঘকাল আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে।

॥ দুই ॥

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লোক-সাহিত্য প্রীতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর সারা জীবনের লেখনী ও বক্তৃতামালার মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন শরৎকুমার লাহিড়ি গবেষণা সহায়ক হিসেবে দীনেশ চন্দ্র সেনের সঙ্গে কর্মরত, সে পর্বে দীনেশ সেন *মৈমনসিংহ গীতিকা* নিয়ে কাজ করছিলেন। এতে শহীদুল্লাহ্‌র কোনো সম্পৃক্ততা ছিল কি না তা কোনো বিবরণ থেকে জানা যায় না। তবে ১৩২৭ (১৯২০) সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আহূত ছাত্রসম্মিলনীতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বক্তৃতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল লোকসাহিত্য-সংগ্রহ নিয়ে। ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর বক্তব্য ছিল [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ২২] :

> ঠাকুর মা ও দিদিমার মুখে মুখে এখনও কত উপকথা, হিঁয়ালি, মেয়েলি ব্রতকথা ও ছড়া রহিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার কর্ম্মনাশা শক্তিতে আশঙ্কা করা হয় শীঘ্রই এ সমস্ত লোপ পাইবে, অথচ এই সমস্ত নৃতত্ত্বের আলোচনায় একটি বিশেষ সহায়।

এর পরের দশকে ময়মনসিংহের পাকুন্দিয়ায় আল হক সাহিত্য সমিতির সভায় (১৩৩৬) মুহম্মদ শহীদল্লাহ্ যে ভাষণ দেন তা পরে 'পল্লী–সাহিত্য' নামে বিভিন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। এতে পল্লিবাসীদের তিনি মনে করিয়ে দেন যে, "পল্লীর ঘাটে, মাঠে.....প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ...... পাড়াগাঁয়ে থেকে আমাদের তা মনেই হয় না।" তাঁর আক্ষেপ ছিল [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৩] :

> আরব্য উপন্যাসের ..... চেয়ে পল্লীর উপকথাগুলির মূল্য কম নয়। আধুনিক শিক্ষার কর্ম্মনাশা স্রোতে সেগুলি বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনকার

> শিক্ষিতা জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা শুনান না; তাদের কাছে বলেন আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare-এর গল্পের অনুবাদ।

স্যাটেলাইট ও ডিজিট্যাল প্রযুক্তির এই যুগে শিশুদের বিনোদনের উপকরণ দেখলে শহীদুল্লাহ্ কী ভাবতেন জানি না! অনেক পরে *Dacca University Journal* (১৯৪০)-এ 'Ancient Indian Folklore' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য ছিল প্রত্যক্ষ [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৪৯১] : "It is a pity that the folklore is almost a neglected subject for our research scholars."

লোকসাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধু আহ্বান নয়, কর্মযোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ১৯৩৭-৩৮ সালের দিকে তিনি জানান যে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৫], "আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা অনার্সের পাঠ্যতালিকায় "মহুয়া" স্থান পাইয়াছে। ...আনন্দের বিষয় আমার চেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে [লোকসাহিত্য সংগ্রহে] সম্প্রতি চেষ্টিত হইয়াছেন"।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের জবানিতে (১৯৫৪) এই চেষ্টা ও তার অকাল সমাপ্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৭৩] :

> ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মত লোক-সাহিত্য প্রেমিক ব্যক্তি আমি অল্পই দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সনে মৈমনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ সহরে পূর্ব মৈমনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি ও আমি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। ...তাঁহার লোক-সাহিত্য-প্রীতি কেবল মাত্র মৌখিক বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তিনি অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হইতে একটি লোক-সাহিত্য-সমিতি গঠন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতির এবং আমি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ পালাগান সংগ্রাহক স্বর্গত চন্দ্রকুমার দে তখন জীবিত ছিলেন। আমাদের আমন্ত্রণে তিনি ঢাকায় আসিয়া আমাদের এই পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীণ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইতিমধ্যেই স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী প্রভৃতি আমাদের পক্ষ হইতে সংগ্রাহক নিযুক্ত হইয়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কয়েকটি অপ্রকাশিত পালাগান ও বহু লোক-গীতি সংগ্রহ করেন। আমিও সমিতির পক্ষ হইতে আমার অবসর সময় এই সংগ্রহের কার্যে নিয়োগ করি এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাই। এমন সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লোক-সাহিত্য-সংগ্রাহক কবি জসীমুদ্দীন সাহেব আমার সহকর্মীরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করেন।... কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ নিতান্ত অপ্রচুর ছিল বলিয়া পরিকল্পনা

> অনুযায়ী আমাদের কার্য অগ্রসর হইতেছিল না। অনন্যোপায় হইয়া ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মৌলভি ফজলুল হক সাহেব ও অর্থমন্ত্রী স্বর্গত নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বিষয়ে বাংলা সরকারের নিকট তিনি অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা উভয়েই প্রয়োজনীয় অর্থ–সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও তৎসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার জন্য কার্য স্বভাবতই আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। কবি জসিমুদ্দীন সাহেবও কর্মান্তর গ্রহণ করিয়া ঢাকা পরিত্যাগ করেন। তারপর যে বৎসর ভারত-বিভাগ হয়, সেই বৎসর আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের কর্ম পরিত্যাগ করি। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাটি সেখানেই অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে।

ভারতবিভাগের পর পূর্ব বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহের ব্যাপারটি শহীদুল্লাহ্‌র কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের (১৯৪৮) মূল সভাপতির ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৫৫]: "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য পূর্ব্ববাংলার সকল স্থান থেকে পুথি, পল্লীগীত, পল্লীকাব্য ও উপকথা সংগ্রহ্ করে রক্ষা করা"। বাংলা সাহিত্যের জন্য একাডেমি গড়ার নানা প্রস্তাবে তিনি লোকসাহিত্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবেও অনেককে লোকসাহিত্য সংগ্রহে উৎসাহিত করেছেন। যেমন রংপুর কারমাইকেল কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক আবু তালিবের কাছে লেখা চিঠিতে (১৯৫৮) তাঁর উপদেশ [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৫৬], "তুমি তোমাদের ছাত্রদের সাহায্যে রংপুরের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করিতে পার"। প্রসঙ্গত আমরা মনে করতে পারি এর প্রায় অর্ধশতক আগে ছড়া সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা ব্রতের আল্‌পনা সংগ্রহের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠির কথা।[৯]

এই সব সংগ্রহের ক্ষেত্রকে শহীদুল্লাহ্ শুধু লোকসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষাপাতী ছিলেন না। যেমন, পূর্বোক্ত চিঠিতে তিনি সাহিত্যের নানা উপকরণের সঙ্গে [উপকথা, ছড়া, সঙ্গীত, গাঁথা, প্রবাদ] লোকসংস্কার (Folk Belief) সংগ্রহেরও তাগিদ দিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে শহীদুল্লাহ্ আধুনিক ফোকলোরবিদদের মতো এ বহুমাত্রিক বিদ্যাশৃংখলাকে সমন্বিত ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪০ সালেই তিনি A. R. Wright-এর Folkore-এর সংজ্ঞার্থকে গ্রহণ করেছিলেন যাতে mental and spiritual life of the folk এর সকল উপকরণকে ফোকলোর হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এর কালগত ব্যাপ্তি Every stage of barbarism and culture বলে দাবি করা হয়েছে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৪৯১]।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ইউনেস্‌কোর *Traditional Culture in South Asia* শীর্ষক জরিপের মধ্যে। মুহম্মদ আবদুল হাইকে সঙ্গে নিয়ে শহীদুল্লাহ্‌ তৎকালীন পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির যে প্রতিবেদন তৈরি করেন তাতে লোকসাহিত্যের পাশাপাশি লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোকশিল্প, কারুকলা ও দেশীয় খেলাধুলাকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়। লক্ষণীয় যে এর লোকসাহিত্য অংশটি মুহম্মদ আবদুল হাই প্রস্তুত করেন; অন্য সবগুলি ধারা সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌। আশরাফ সিদ্দিকীর *লোকসাহিত্য* (১৯৬৩) গ্রন্থের ভূমিকায়ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ গাথা, উপকথা, ছড়া, পল্লিগান, প্রবাদ, হিঁয়ালী ও পুরাণকথার সঙ্গে লোকাচার, লোকসংস্কার, খেলাধুলা, হস্তশিল্প, এমনকি রন্ধন ও খাদ্যগ্রহণ প্রণালীকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের Folklore Society-র কার্যকলাপ সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্‌ সচেতন ছিলেন। ১৩২৭ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি ইউরোপীয় ফোকলোর সমিতির কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলেন। এ সমস্ত সমিতির উদ্‌যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথা সংগ্রহ সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন যার উল্লেখ পাওয়া যায় মুসলিম হল বার্ষিকীতে 'আমার কাহিনী ফুরুলো' (১৩৩৩) ও পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে (১৩৪৫)। পূর্বে উল্লেখিত 'পল্লী সাহিত্য' (১৯৩৬) প্রবন্ধে ফোকলোর সোসাইটি সম্পর্কে তাঁর বিবেচনা [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৪]।

> কে আছে এই উপকথাগুলিকে সংগ্রহ ক'রে তাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংশ থেকে রক্ষা করবে? ইউরোপ, আমেরিকা দেশে বড় বড় বিদ্বানদের সভা আছে যাকে বলা হয় Folk-lore Society. তাঁদের কাজ হচ্ছে এই সব উপকথা সংগ্রহ করা এবং অন্য সভ্য বা অসভ্য দেশের উপকথার সঙ্গে তার সাদৃশ্য নিয়ে বিচার করা।

ফোকলোর, বিশেষত লোকসাহিত্যের উপকরণকে সাহিত্য ও ভাষার নিরিখে বিবেচনা করা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জন্য স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে শহীদুল্লাহ্‌ এক্ষেত্রে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র সম্মিলনীতে (১৩২৭) শহীদুল্লাহ্‌ এদিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এভাবে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ২২]—

> ইতিহাসের উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপরূপে, প্রাচীন মন্দির মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্ত্তিরূপে কিংবা লোকমুখে ছড়া ও কিংবদন্তীরূপে ছড়ান রহিয়াছে। মানিকচাঁদ রাজার গান লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের উপকরণ— বিশেষত লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, প্রভৃতিকে 'শিশুতোষ' তকমা দান করার এবং শুধু শিশু মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করার একটা প্রবণতা আমাদের সমাজে সুপ্রচলিত। এ সকল উপকরণ সাহিত্য ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি (১৩৩৩) সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকীতে অন্য সাহিত্য বিষয়ের বদলে 'আমার কাইনী ফুরুলো' শীর্ষক লোককথার চিরাচরিত চরণটি দিয়ে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৭], "উপকথাগুলি কেবল ছেলে ভুলাইবার জন্য নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকও তাহার মধ্যে অনেক কিছু জানিবার ও খুঁজিবার জিনিস পাইবেন। ...অজানা অতীতের অনেক রহস্য উপকথাগুলির সাহায্যে পরিষ্কার হইয়া যায়"।

তাঁর এই মত সমকালে খুব সাড়া পেয়েছিল বলে মনে হয় না। পরের দশকে (১৩৩৬) 'পল্লী-সাহিত্য' প্রবন্ধে তাই তিনি উদাহরণ টানলেন ইউরো-মার্কিন জ্ঞানচর্চার – "এগুলি [রূপকথা, উপকথা] নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ বলে ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হয়"। একই প্রবন্ধে তিনি প্রবাদ ও বচন চর্চার গুরুত্বও তুলে ধরেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৪]। —

> প্রবাদবাক্যে ও ডাক ও খনার বচনে কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ক ফল সঞ্চিত হ'য়ে আছে কে তা অস্বীকার করতে পারে? শুধু তাই নয়, জাতির পুরানো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

এভাবে প্রবাদের মধ্যে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৭১] "অতীতের মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাস" (১৩৪৫), লোকসংস্কার ও পুরাণকথার মধ্যে নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ (১৯৬৩) প্রভৃতির দিকে তিনি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ৪]।

বাংলা ফোকলোরের নৃতাত্ত্বিক আত্মীয়তা এবং গোষ্ঠী সংযুক্তি সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নিজস্ব ভাবনা ছিল। তাঁর নানা মত থেকে মনে করা যেতে পারে যে তিনি বাংলার এই উপকরণের সঙ্গে একদিকে অস্ট্রো-এশীয় এবং তিব্বতি বর্মি নৃগোষ্ঠীর এবং অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়দের সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করতেন। পূর্ব্ব–ময়মনসিংহ সাহিত্য–সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণে (১৩৪৫) তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৫]। —

> ... কোন্ উপকথার বৈজ্ঞানিক তুলনামূলক আলোচনায় নৃতত্ত্বের কত মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ...বাঙ্গালার কোন উপকথা যদি কোল, সাঁওতাল, খাসী, মন, খোর প্রভৃতি অষ্ট্রো - এশিয়াটিক জাতির মধ্যে, কিংবা বোড়ো, নাগা, গারো, টিপরা, প্রভৃতি তিব্বতী-বর্ম্ম জাতির মধ্যে, অথবা তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালাবারী,

> তুলু, কুড়াগু প্রভৃতি দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে বিকৃত বা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালার আর্য্য জাতিদের রক্তের অনেক গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া পড়ে না কি?

এই মন্তব্য থেকে এমন দাবিও করা যায় যে শহীদুল্লাহ্‌ বাংলা ফোকলোরের অন্তত বেশ কিছু উপকরণকে প্রাক-আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মেনে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার শব্দগঠনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। মন্তব্যটিতে বাঙালির জনগঠনে আর্যধারার আধিপত্য নিয়ে তির্যক প্রশ্নবোধক চিহ্নও প্রত্যক্ষ।

সাহিত্যের উপকরণের বাইরে লোকসংস্কারের সঙ্গে নৃতত্ত্বের সম্পর্ক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি অনুধাবন করেছিলেন (১৩৪৫) যে, "নৃতত্ত্বের ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের আলোচনায় এই সংস্কারগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশী" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৭২]। অনেক পরে আশরাফ সিদ্দিকীর *লোকসাহিত্য* গ্রন্থের (১৯৬৩) ভূমিকায় তাঁর ব্যাখ্যা [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ৫]—

> জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে বিভিন্ন লোকাচার নানা সমাজে প্রচলিত আছে, তার অল্পই শাস্ত্রসম্মত। ... তার (শাস্ত্রাচরের) আগে বা পিছে যত আচার সকলই লোকাচার এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন। এই লোকাচারগুলিও নৃতত্ত্বের একটি মূল্যবান উপকরণ।

লক্ষণীয় ধর্মপ্রাণ শহীদুল্লাহ্‌ এখানে লোকাচারের ধর্ম-অধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

বাংলা ফোকলোরের পূর্বপুরুষের সন্ধানের ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ অস্ট্রো-এশীয় ও দ্রাবিড়দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন (১৩৪৫)। পরে ইউনেস্‌কোর পূর্বে উল্লেখিত প্রতিবেদনে (১৯৫৬) তাঁর মন্তব্য ছিল [Muhammad Shahidullah 1963 : 3] :

> Some folklore, folk music and folk dance of Bengal are possibly of Austro-Asiatic origin. Some trace their influence even in the post-Vedic Hindu religion.

এই দুই মন্তব্যের মধ্যবর্তী সময়ে *Dacca University Journal*-এ লেখা (১৯৪০) 'Ancient Indian Folkore' প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ্‌ প্রাচীন ভারতীয় ফোকলোরকে ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-ইরানীয় অতীত দিনের স্মৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মত প্রকাশ করেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪: ৪৯১] –

> Ancient Indian folklore not only throws light on the mental and spiritual life of the ancient Indo - Aryans, but also helps us to understand the primitive cultural history of the undivided Indo-Iranians and even to get a glimpse of the mind of the Indo-Europeans at the hoary past hardly yet emerged from barbarous state.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী ফোকলোরবিদদের একটি প্রধান চর্চার বিষয় ছিল এর উপকরণের উদ্ভব ও বিকাশের সূত্র সন্ধান। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ইংরেজ ফরাসি জার্মান সিভিলিয়ান ও খ্রিস্ট মিশনারিরা এ পর্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে ফোকলোরের বিপুল উপকরণ সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন। এ সকল উপকরণের মধ্যে নানা সাদৃশ্য এর এককেন্দ্রিক উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ম্যাক্স্ মুলারের পথ ধরে জার্মান ভারততত্ত্ববিদ থিওডর বেনফে *পঞ্চতন্ত্র*-এর গল্পগুলোর বিশ্লেষণ করে দাবি করেন যে, ইউরোপীয় লোককথা মূলত ভারতীয় বৌদ্ধ নীতিকথামূলক গল্পের রূপান্তর। পরে স্কেনডিনেভীয় গবেষক জুলিয়াস ক্রোন ও কারলে ক্রোন এই চিন্তাধারাকে আরও বিকশিত করেন যা ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিরূপে প্রতিষ্ঠা পায় [Dorson 1973 : 56]।

প্যারিস বাসকালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ সকল তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কি না, জানা যায় না। তবে জার্মানির জ্ঞানসাধনা সম্পর্কে তার অবহিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। প্যারিস থেকে ফিরে ময়মনসিংহে তাঁর বক্তৃতায় (১৩৩৬) শহীদুল্লাহ্ শেক্সপিয়ারের রাক্ষসের বুলি 'Fie, Foh, and Fum, I smell the blood of a British Man' এর সঙ্গে বাংলা রূপকথার 'হাঁউ, মাঁউ, খাঁউ, মান্সের গন্ধ পাঁউ' এর সাদৃশ্য দেখিয়ে প্রশ্ন করেন,

"এ সাদৃশ্য হল কোথা থেকে? তবে কি একদিন ঐ শাদা ইংরেজ ও এই কাল বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরষগণ ভাই ভাই রূপে একই তাঁবুর নীচে বাস করত? সে আজ কত দিনের কথা, কে জানে?" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৪]।

অনেক পরে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি শহীদুল্লাহ্ 'গল্পের জন্মান্তর' (১৩৬৫) ও 'গল্পের রূপান্তর' (১৩৬৬) নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ২৮৫–২৮৮] তিনি বাঘের গলা থেকে বকের হাড় বের করে আনা ও পরে বাঘ কর্তৃক বককে খেয়ে ফেলার হুমকির পরিচিত গল্পটির সাম্প্রতিক উৎস রূপে টমাস জেমসের *Aesoples Fables* (১৮৪৮)-এর উল্লেখ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *কথামালা* (১৮৫৬)-য় এরই অনুবাদ করেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ এ গল্পের গ্রিক রূপান্তর উপস্থাপন করেন যাতে নেকড়ে বাঘের গলার হাড় বের করেছিল একটি সারসপাখি। শহীদুল্লাহ্ প্রমাণ করেন যে পালিভাষার 'জবসকুন জাতক'-এ প্রায় একই ধরনের গল্প আছে যাতে এক কাঠঠোকরা পাখি এক সিংহের গলা থেকে হাড় বের করে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। তবে হিমবান প্রদেশের এই কাঠঠোকরা পূর্বজন্মে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। অর্থাৎ বলা যায় ভারতীয় পুরাণ থেকে এই গল্প গ্রিসে গিয়েছে।

ভারতবর্ষের এই গল্প গ্রিসে যাওয়ার যে ব্যাখ্যা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রদান করেন, ইউরোপীয় ফোকলোরবিদরা তাকেই Migration Theory (পরিভ্রমণ তত্ত্ব) বলে জানেন। শহীদুল্লাহ্ এই পরিভ্রমণের দুটো সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ২৮৮]। –

> ....বৌদ্ধ জাতকের পূর্বে কাশ্যপ মুনির নামে এইরূপ কতকগুলি গল্প প্রচলিত ছিল। এই কাশ্যপকে বুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী 'অতীত বুদ্ধ' বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ জাতকে বুদ্ধের জন্মান্তরকালীন ঘটনা বলিয়া এই গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে; এই কাশ্যপের (গ্রীক kybises) গল্পগুলি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে (বোধ হয় আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের ফলে) গ্রীসে প্রচারিত হয়।

অথবা

> কাশ্যপের গল্পগুলি ভারত হইতে ২৪১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে সিংহলে আনীত হয়। ইহার প্রায় ৩০০ বৎসর পরে ইহাদের মধ্যে ১০০টি গল্প সিংহল দেশীয় এক রাজদূত দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়াতে আনীত হয়। তাহাদিগকে Logoi. Lubikoi বা লিবিয়া দেশী কাহিনী নামে গ্রীক ভাষায় তর্জমা করা হয়। এইরূপে এই ভারতীয় গল্পগুলি গ্রীসদেশে প্রচারিত হইয়া পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশীয় ভাষায় ছড়াইয়া পড়ে।

থিওডর বেনফে পরিভ্রমণ তত্ত্বেও প্রায় একই কথা বলেছিলেন [Dorson 1973 : 56]। তাঁর মতে আরব বণিকরা ভারতে এসব গল্প শুনেছিলেন এবং আরবদের স্পেন-বিজয়ের পর তারা তা ইউরোপে ছড়িয়ে দেন। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় বণিকরা প্রভাবশালী হয়ে উঠলে তারাও গল্পের বাহকের কাজ করেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষ অভিযানে অংশগ্রহণকারী মঙ্গোলীয়রা এসব গল্পকে পূর্ব ইউরোপে নিয়ে যান।

পরের বছর (১৩৬৬) শহীদুল্লাহ্ 'গল্পের রূপান্তর' প্রবন্ধে *পঞ্চতন্ত্র*-এর একটি গল্পের গ্রিক পাঠান্তরের রহস্য উন্মোচন করেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪: ২৮৯–২৯৩]। গল্পে এক ইঁদুরনী মুনীর আশীর্বাদে নারীতে রূপান্তরিত হয়। যোগ্য বয়সে মুনি তাকে যথাক্রমে সূর্য, মেঘ, বায়ু ও পর্বতের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলে কন্যা তাতে রাজি হয় নি; শেষে পুনরায় ইঁদুরণী হয়ে এক ইঁদুরকে বিয়ে করে। শহীদুল্লাহ্ এর একটি পাহলভি অনুবাদ (৫৫০ খ্রি.), 'কলীলা ও আদিম্না'-য় আরবি অনুবাদ এবং দ্বাদশ শতকে নস্‌রুল্লাহ গজনভী ও পঞ্চদশ শতকে 'আনওয়ার-ই-সহরণী'তে পারসি অনুবাদের (৭৫০ খ্রি.) সন্ধান দেন। তাঁর অনুসন্ধানে গ্রিক ভাষায় ঈশপের একটি গল্প পাওয়া যায় যাতে একটি বিড়াল দেবী আফ্রোদিতির বরে নারীতে পরিণত হলেও শেষ পর্যন্ত বিড়ালের স্বভাবেই প্রত্যাবর্তন করে। শহীদুল্লাহ্ মন্তব্য করেন যে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ২৯২] "[কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও] উভয় কাহিনীরই উপদেশ এক ....। ঈশপের

অন্য কয়েকটি গল্পের ন্যায় এ গল্পটিও ভারতীয় গল্পের একটি রূপান্তর"। প্রসঙ্গত ইদানীং আফ্রিকার ফোকলোরবিদরা ঈশপের গল্পকে আরব-আফ্রিকার ইসুফের গল্পের রূপান্তর বলে দাবি করেছেন।

'পল্লী সাহিত্য' (১৩৩৬) নিবন্ধেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলার রূপকথার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐক্যের ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর ভাষায় [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৩]। —

> কোন্ সুদূর অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই রূপকথাগুলি নষ্ট হ'য়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে। যদি আজ বাংলায় সমস্ত রূপকথাগুলি সংগৃহীত হত, তবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে বাংলার নিভৃত কোণে কোন পিতামহী মাতামহীর গল্প ভারতের অন্য প্রান্তে কিংবা ভারতের বাহিরে সিংহল, মালয়, সুমাত্রা, যাভা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে এমনি ভাবে প্রচলিত আছে। হয়ত এশিয়ার বাহিরে ইউরোপ খণ্ডে লিথোনিয়ায় কিংবা ওয়েলসের কোন পল্লী-রমণী এখনও হুবহু বা কিছু রূপান্তরিতভাবে সেই উপকথাগুলিকে .... শুনাচ্ছে।

পরে প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ *বাংলা সাহিত্যের কথা*-য় অন্তর্ভুক্তির সময়ে তিনি ইউরোপে বেদীয়া (Gypsy) জাতির মধ্যে এই রূপকথাগুলো প্রচলিত থাকার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮ : ১৩৩]। উল্লেখ্য, পরে সুকুমার সেনও ইউরোপে জিপসিদের মধ্যে ভারতীয় গল্প-কাহিনি প্রচলিত রয়েছে বলে দাবি করেছেন[১০]।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতায় (১৯৪৮, শহীদুল্লাহ্ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকেও এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৫১] :

> দক্ষিণ–পূর্ব্ব এশিয়ার এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও বাংলার ছাপ রয়েছে। বাংলার উপকথা এখনও সেখানে প্রচলিত আছে। বাংলার রক্ত যে তাদের রক্তের সঙ্গে মেশেনি, তা কে বলতে পারে? জাভার বরবুদুরের স্থাপত্য উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের মঠের স্থাপত্যের অনুকরণে।

বাংলা লোককথার ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ার দুটি উদাহরণ পাওয়া যায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র *বাংলা সাহিত্যের কথা*-র প্রথম খণ্ডে। 'কাজলরেখা'র বাংলা ও হিন্দুস্তানী পাঠ তুলনা করে তাঁর সিদ্ধান্ত [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮ : ১৩৩]। –

> মূলে একই উপকথা হইতে এই দুইটি উপকথা রচিত হইয়াছে। তবে বাঙ্গালার প্রচলিত উপকথাটি প্রাচীন বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। হিন্দুস্থানী উপকথাটি মুসলমানী ঢঙে ঢালা হইয়াছে। সুতরাং এই কাজলরেখার কাহিনীটি বাঙ্গালার প্রাচীন যুগের তাহা আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি।

'শীত ও বসন্ত' গল্পের বাংলায় প্রচলিত তিনটি পাঠ ও একটি হিন্দুস্তানী পাঠের মধ্যে তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেন। বিস্তারিত যুক্তি দেখিয়ে শহীদুল্লাহ্ দাবি করেন যে, [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮ : ১৫০] "মূল উপকথাটি বাঙ্গালার প্রাচীন যুগের, হয়তো তাহারও পূর্ব্বের। চেষ্টা করিলে তাহার আদিম রূপের কিছুটা উদ্ধার করা অসম্ভব নহে"।

পাশাপাশি বাংলা ফোকলোরের ওপর বৃহত্তর ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাবও তিনি স্বীকার করতেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকীতে (১৩৩৩) 'আমার কাইনী ফুরুলো' প্রবন্ধে তিনি বাংলা "কাইনী গেল বাইনি" ছড়াটিকে তেলেঙ্গার 'কাহিনি গেল কাঞ্চি' ছড়ার রূপান্তর বলে মত দিয়েছেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫০] "মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে তেলেঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। ...অনুমান করা যাইতে পারে যে তেলেঙ্গাদের নিকট হইতে বাঙ্গালী তাহার এই সুপ্রসিদ্ধ ছড়া পাইয়াছে"। আনারস অর্থসূচক "বন থাইকা বারা'ল টিয়া"... ধাঁধাটিকে তিনি বিদেশী ধাঁধা, সম্ভবত পর্তুগিজ ধাঁধা থেকে আগত বলে মনে করেন [সৈয়দ জিল্লুর রহমান ১৯৬৮ : ৪]।

প্রকৃতিকে ঘিরে নানা বিস্ময়, বিপর্যয় ও দুর্যোগের আতংক ও তার থেকে নিষ্কৃতির প্রয়াস প্রভৃতি থেকে আদিম মানুষ যে কল্পকাহিনি তৈরি করেছিল তারই সমন্বিত রূপ পুরাণ (Myth)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পুরাণকথার সৃষ্টি নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর বিবেচনায় [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ৪] –

> আদিম কালেই মানুষের মনে নানা বিষয়ে কৌতূহল জেগে ছিল। বিজ্ঞানের বীজ হল কৌতূহল। তখন কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে তারা অনেক পুরাণ কথা (myth) সৃষ্টি করেছিল। কেন চন্দ্রে গ্রহণ লাগে, ...কেন চাঁদের ঐ কলঙ্ক, কেন ভূমিকম্প হয়, এইরূপ বহু প্রশ্নের সমাধান আদিম মানুষ করেছিল পুরাণ কথা সৃষ্টি করে।

বিশ্বাস-সংস্কার থেকে পুরাণ এবং পুরাণ থেকে লোককথা সৃষ্টির বৃত্তটিকেও শহীদুল্লাহ্ চিহ্নিত করেছিলেন। লোকসংস্কারের ব্যাখ্যা (১৩৬৬) করতে গিয়ে তিনি চাঁদের কলঙ্কের সঙ্গে বটের তলায় বসে বুড়ির চরকায় সুতো কাটার গল্পের প্রসঙ্গ এনেছেন। আশরাফ সিদ্দিকীর *লোকসাহিত্য* (১৯৬৩) গ্রন্থের ভূমিকায় শহীদুল্লাহ্ দাবি করেছেন যে [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ৪] "হিন্দু সমাজের ব্রতকথা, মুসলমান সমাজের বনবিবি, কালুগাজী–চম্পাবতী প্রভৃতি কিচ্ছা এই পুরাণ কথার শামিল। এই পুরাণ থেকেই মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে"। এরও অনেক আগে পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর ভাষণে (১৩৪৫) চাঁদের কলঙ্ককে ঘিরে পুরাণ ও লোককথার নানা রূপান্তরের চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৭৩]–

> ...... সংস্কার উপলক্ষে নানা উপকথাও প্রচলিত আছে। চাঁদে কলঙ্ক কেন – হিন্দু পুরাণে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রের কোলে একটি মৃগ আছে, এবং এই সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই জন্য সংস্কৃতে চন্দ্রের এক নাম মৃগাঙ্ক। বৌদ্ধ জাতকে বলা হইয়াছে সক্ক (শক্র) চাঁদের উপর শশকের ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের শশকরূপে পূর্ব্ব জন্মের একটি উপাখ্যান বর্ণনা করা হইয়াছে। ......সাধারণের যে এইরূপ সংস্কার ছিল, তাহার প্রমাণ চন্দ্রের শশধর, শশাঙ্ক নাম। আমাদের লোক-সংস্কার ছিল বা আছে যে চাঁদের মা বুড়ী বটতলায় বসিয়া সূতা কাটিতেছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে জার্মানির গ্রিম-ভ্রাতাদের মতো লোককথার বিশ্লেষণে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Philology) থেকে বিকশিত ধারণার প্রয়োগ করেছিলেন। উইলিয়াম ও জেকব গ্রিম, ম্যাক্স মুলার, এডওয়ার্ড টেইলর, এনড্রু ল্যাঙ্গ–উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের শুরুর দিকের এসব ফোকলোরবিদ পুরাণ রূপান্তরিত হয়ে লোককথার সৃষ্টির তত্ত্ব বিকশিত করেছিলেন। ভগ্নপুরাণতত্ত্ব (Solar Mythology Theory) এরই পরিণতি [Dorson 1973 : 55]। শহীদুল্লাহ্ উপস্থাপিত তথ্যগুলোও এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে। অন্যদিকে বেদ ও সংহিতায় চাঁদের কলঙ্ক ; চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ; ছায়াপথ; ইন্দ্রধনু; ভূমিকম্প; মেঘের পর্বতগমন; তুলসিগাছ; ব্যাঙ, হাতি ও তোতার বাক্ হারানো; বসন্ত রোগ ও দুরাত্মা, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি সংক্রান্ত উপাখ্যানকে প্রাচীন ভারতীয় Folklore জাত বলে মনে করেন (১৯৪০) [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৪৯১–৪৯৫]। তাঁর মতে অনেক আদিম সমাজে এখনো এ-ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। ১৯২৫ সালে মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সিলেট থেকে 'হীরাধর বানিয়ার গীত' সংকলন করে তাঁর কাছে পাঠালে, শহীদুল্লাহ্ সংগ্রহের প্রশংসা করেও পাঠ পরিবর্তনের সমালোচনা (১৯২৫) করেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৩১]—

> .... কোন কোন গানে আপনার কিছু যোজনা দেখিলাম। তাহা আমার বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই। যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিলে ঐগুলি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া গণ্য হইবে।... আপনি দীনেশ বাবুর 'মৈমনসিংহ গীতিকা' দেখিয়াছেন কি? তাহা হইলে অনেকটা ধরন বুঝিতে পারিবেন।

এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, দীনেশ চন্দ্র সেনের *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র সম্পদনাকার্য শহীদুল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর বিবেচনায় দীনেশ সেন গীতিকাগুলো "যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ" করেছিলেন। সেক্ষেত্রে মূলের কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার দায়িত্ব সংগ্রাহকদের। সে-বিবেচনায় ইদানীং যারা

দীনেশ সেনের পাঠের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করছেন, তাদের চিন্তা বিভ্রান্ত বলে মনে হয়।

তবে ১৯৬০-এর দশকে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের *হারামণি*-র চতুর্থ খণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশের ব্যাপারে শহীদুল্লাহ্‌র মতামত চাইলে তিনি হিন্দুপুরাণ সম্পর্কিত গানগুলি বাদ দিতে বলেছিলেন[১১]। সম্ভবত সে সময়ে বাংলা বিভাগের ওপর পাকিস্তান সরকারের যে শ্যেন দৃষ্টি ছিল, তাতে হয়তো এ প্রকাশনা তাঁর কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছিল। এটি স্পষ্ট যে বাংলা লোকসাহিত্যের উপকরণের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'পল্লী-সাহিত্য' (১৩৩৬) প্রবন্ধে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন: "এই সমস্ত রূপ-কথা, পল্লীগাথা, ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো জল বাতাসের মত সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। তাতে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ নাই" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৬]।

১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তান সরকারের তাহজিব-তমুদ্দুনের ঢলের মধ্যেও রেডিও পাকিস্তানের বেতার কথিকাতে এই মত তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন [সৈয়দ জিল্লুর রহমান ১৯৬৮ : ২] "বাংলা ছড়াগুলি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ নির্বিশেষে এদেশে সকল সমাজে প্রচলিত"।

পাঠ পুনর্বিচার, পুনর্নির্মাণ, আদিপাঠ (Ur text) সন্ধান, পাঠান্তর বা কথান্তর বিবেচনা প্রভৃতি গত কিছুদিন ধরে ফোকলোর চর্চায় গুরুত্ব পেয়ে আসছে। শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'মুসলিম হল বার্ষিকী'র লেখায় (১৩৩৩) "আমার কথাটি ফুরুলো" শীর্ষক ছড়াটির লালবিহারী দের *Folk Tales of Bengal* (১৮৮৩)-এ সংকলিত পাঠ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *খুকুমণির ছড়া*-র পাঠ এবং চব্বিশ পরগণার বশিরহাটে প্রচলিত পাঠ তুলনা করেছেন। একই সঙ্গে অন্ধ্র প্রদেশে প্রচলিত এই ছড়ার একটি পাঠান্তরও তিনি উপস্থাপন করেন। দুটি ছড়ার অংশবিশেষ এরকম [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৮-৪০]—

বাংলা	অন্ধ্র
ছেলে ক্যানো কাঁদে?	ছেলে কেন কাঁদে?
ক্যান্‌ডা ছেলে কাঁদিস?	ছেলে! ছেলে! কেনরে কাঁদিস্?
পিঁপ্‌ড়ে ক্যানো কামড়ায়?	কেন কামড়ালে?
ক্যান্‌ডা পিঁপড়ে কামড়াস?	পিঁপড়া! পিঁপড়া! কেন রে কাম্‌ড়ালি?

পূর্ব ময়মনসিংহে উল্লিখিত ভাষণে (১৩৪৫) শহীদুল্লাহ্ "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" ছড়াটির তিনটি পাঠ দিয়ে ছন্দ ও অর্থবোধকতার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ ও যোগীন্দ্রনাথের পাঠের চেয়ে *খোকাখুকুর ছড়া*-য় ব্যবহৃত বিক্রমপুরের পাঠকে প্রকৃত পাঠ বলে মত দিয়েছেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৭-৬৮]। ছন্দ ও অর্থবোধকতার নিরিখে পাঠ

নির্ণয়ের এই পদ্ধতি শহীদুল্লাহ্ চর্যার পাঠ নির্ণয়েও ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "ছড়াগুলির বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত পাঠান্তর নির্ণয় এবং বঙ্গালার বাহিরের ছড়ার সহিত তুলনা প্রয়োজন"... ।

তবে তুলনামূলক পাঠ-সমালোচনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বড় কৃতিত্ব *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র 'মহুয়া' ও *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*-র 'ভেলুয়া সুন্দরী'র পাঠ বিচার [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : ৪৪৯-৪৬০]। *বাংলা সাহিত্যের কথা*-র দ্বিতীয় খণ্ডে এই পাঠবিচারে তিনি দীনেশ চন্দ্র সেনের 'মহুয়া'র সঙ্গে কিশোরগঞ্জের পূর্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত (১৩২২) পাঠের অনুলিপি এবং এর মুদ্রিত পাঠ 'বাদ্যানীর গান'-এর (১৩৪৯) তুলনামূলক আলোচনা করে মূল পাঠ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সহায়ক হিসেবে শহীদুল্লাহ্ বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য* গ্রন্থে রওশন ইজদানীর আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

তুলনামূলক পাঠ বিচার করে শহীদুল্লাহ্ দেখান যে 'মহুয়া'র সঙ্গে 'বাদ্যানীর গান'-এর ঘটনাগত পার্থক্য মৌলিক নয়; বরং পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মুদ্রণের সময় পাণ্ডুলিপির পাঠ নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন করেছেন। হুমড়া সেখানে ওমরা, মহুয়া মেওয়া এবং মহুয়ার জন্মদাতা পিতা জগন্নাথ ঠাকুর। শহীদুল্লাহ্ রওশন ইজদানীর বরাত দিয়ে জানান যে চন্দ্র কুমার দে সংগৃহীত গীতিকা প্রকাশকালে ওর কিছু চরিত্রের নামকরণে "অনধিকার হাত দেওয়া হয়েছে"; কিন্তু "যেখানে যেমনটি শুনেছিলেন, কাহিনী ঠিক তেমনটিই সংগ্রহ করেছিলেন" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : ৪৫৮]। রওশন ইজদানীর মত গ্রহণ করে শহীদুল্লাহ্ মনে করেন যে 'মহুয়া'র কাহিনী নিয়ে যে বিতর্ক তা প্রকৃতপক্ষে গীতিকার সঙ্গে নাট্যরূপের বা যাত্রারূপের পার্থক্য। শহীদুল্লাহ্ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, "লোক-সাহিত্যের এই অমূল্য সাহিত্যের মূল দীনেশ বাবুর হাতেই রক্ষা পাইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত হয় নাই" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : ৪৫৯-৬০]। প্রসঙ্গত:[১১] ১৯৬০-এর দশকে চেক-গবেষক দ্যুসান জেবিট্যাল ময়মনসিংহ গীতিকার প্রামাণিকতা নিয়ে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[১২]। তিনি ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের *প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকা* (১৯৭০)-য় 'মহুয়ার' পাঠ দেখে যেতে পারলে তুলনামূলক আলোচনাটি আরও প্রামাণ্য হতে পারত। শহীদুল্লাহ্ দ্বিজ কানাইকে 'মহুয়া'র রচয়িতা বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে এটি কোনো "মুসলমান কবির" রচনা [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : ৪৫৯-৫০]। তবে আরও গবেষণা না করে এ মতও গ্রহণ করা যায় না।

'ভেলুয়া সুন্দরী'র তুলনামূলক পাঠ আলোচনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*-য় বানিয়াচঙ্ থেকে সংগৃহীত চন্দ্রকুমার দের পাঠ, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত আশুতোষ চৌধুরীর পাঠ এবং মুন্‌শী মোয়াজ্জেম আলীর 'আমির সদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরী' পুথিকে গ্রহণ করেছেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : ৪৬৭-৭০]। শহীদুল্লাহ্ আশুতোষ

চৌধুরীর পাঠ অলৌকিকতা বর্জিত বলে প্রশংসা করেছেন এবং তিনটি পাঠের কিছু সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ধারণা আশুতোষ চৌধুরীর পাঠটিও কোনো মুসলমান কথকের কাছ থেকে পাওয়া। এ প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ্ দীনেশ চন্দ্র সেনের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৫ : ৫৯]। —

> শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন উভয় কাহিনী [র] ...তুলনামূলক আলোচনা করেন নাই। কারণ তিনি এই গীতিকাগুলির সাহিত্য-মূল্যই দিয়াছেন; আধুনিক লোক-বিজ্ঞানীদের ন্যায় কষ্টি পাথরে আসল বা মেকির খাদ বিচার তিনি করিতেন না। লোক-বিজ্ঞানের চর্চা তখনও এই দেশে হয় নাই। তবে লোক-সাহিত্যের গুপ্তধন উদ্ধারে দীনেশবাবু যেরূপ সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন, তাহাতেই তিনি চিরস্মরণীয় এবং বর্তমান যুগের লোক-বিজ্ঞানীদের পূর্বসূরী।

বস্তুতপক্ষে শহীদুল্লাহ্ গবেষণা জীবনের শুরুর দিক থেকেই *মৈমনসিংহ গীতিকা*-র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন। 'পল্লী-সাহিত্য' (১৩৩৬) প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য, "ময়মনসিংহ গীতিকা... সাহিত্যের অমূল্য খনি পল্লীজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে আছে" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৩]। পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীতে (১৩৪৫) শহীদুল্লাহ্‌র মন্তব্য ছিল আরও উচ্ছ্বসিত [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৩-৬৪]—

> শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্কলিত "ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা"......বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব মধুর ভাণ্ডার....। Thomas Percy-র Reliques of Ancient English Poetry (১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ) প্রকাশের ফলে যেমনে ইংরেজী সাহিত্যে এক নূতন ধারা সংযোজিত হইয়াছিল, এই "ময়মনসিংহ গীতিকা" ও "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা" প্রকাশেও তদ্রূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিতে হইয়াছে।

ঐ বক্তৃতায় শহীদুল্লাহ্ উল্লেখ করেন যে, এ ধরনের রচনা পুরাণ নির্ভর অথবা ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের আদলে তৈরি নয়, যে প্রবণতা তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তাঁর ভাষায় [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৭-৬৮]—

> এ অঞ্চলের গীতি-লেখকেরা কাব্যের বস্তুর জন্য পুরাণের পুঁথি ঘাটিতে যান নাই কিংবা কোন দূর দেশ হইতে নায়ক নায়িকা আমদানি করেন নাই। নিজেদের বাড়ীর চারি পাশে কাব্যের যে অপরূপ সুরভি ফুল ফুটিয়াছিল তাহা হইতেই তাঁহারা অম্লান গীতিমাল্য রচনা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ গীতিকার এই এক চমৎকার বিশেষত্ব। এইজন্যই সেগুলি এরূপ বস্তুতান্ত্রিক, এরূপ স্বাভাবিক, ও এরূপ মর্ম্মস্পর্শী।

বাংলার ব্রতকথাগুলির প্রতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিশেষ আগ্রহ ছিল। পূর্বোক্ত ভাষণে (১৩৪৫) শহীদুল্লাহ্ এই ধারণা ব্যক্ত করেন যে ব্রতকথা থেকেই বাংলার মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালীর সৃষ্টি হয়েছে [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৬]। —

> ব্রত ও ব্রত কথাগুলি লইয়া লৌকিক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করা যাইতে পারে। ....ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি এই ব্রত কথার বীজ লইয়াই রচিত হইয়াছিল। সত্যপীরের পাঁচালী এখনও ব্রত কথার রূপ ছাড়িয়া কাব্যে পরিণত হয় নাই। বাঙ্গালার বাহিরে কোথাও এইরূপ ব্রত কথা প্রচলিত আছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়।

শহীদুল্লাহ্ মনে করতেন যে [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮ : ২২]। "কতকগুলি ব্রত-কথা যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের, কিংবা তাহারও পূর্ব্বের সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বাংলা লোককথার এই প্রাচীনতা তিনি এর ব্যবহারকারীদের ধর্মীয় ও কুল-পরিচয় দিয়েও বিচার করেছেন এবং এর প্রচীনতা দাবি করেছেন [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮ : ১০]।

> আমরা মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে কোনও লিখিত উপকথা পাই নাই সত্য। কিন্তু অনেক উপকথা যেমন বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এবং হিন্দু মুসলমান উচ্চ নীচ সর্ব্বশ্রেণির নিরক্ষর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহাতে এইগুলির উৎপত্তি যে মুসলমান আমলের পূর্ব্বে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। ...দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি রাখালের পিঠা গাছ এবং সখী সোনার উপকথার উল্লেখ করিতে পারি।

বহু সংখ্যক লোকছড়ার প্রাচীনতা সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। *বাংলা সাহিত্যের কথা* (১৯৫৩)-য় তাঁর মন্তব্য [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮: ১৬৪]। —

> কিন্তু [সকল] ছড়া এক সময়ের নহে। ...আমরা অনুমান করিতে পারি ...যে কতকগুলি ছড়া বাঙ্গালার মুসলমানী আমলের পূর্বের।

এর অনেক আগে পূর্ব ময়মনসিংহের ভাষণে (১৩৪৫) শহীদুল্লাহ্ দাবি করেন যে, "খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, বর্গী এল দেশে". ছড়াটী বর্গীর হাঙ্গামার সময়ের; সুতরাং আধুনিক"। ..."আপনি যাব গৌড়, আনব সোনার ময়ূর"। ....এই ছড়াটি গৌড় রাজধানীর সময়ের [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪: ৫৬৭] : প্রসঙ্গত, সুকুমার সেনও লোকছড়াকে অত্যন্ত প্রাচীন মনে করতেন এবং "আদিম কবিতার বীজ" আখ্যা দিয়েছিলেন[১৩]।

একইভাবে প্রবাদবাক্যের কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে শহীদুল্লাহ্র দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ (১৩৩৬) "... পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর এই প্রবাদ বাক্যটী সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন পাণ্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৫]। হেঁয়ালী বা ধাঁধাকে তিনি "প্রাচীন জগতের সৃষ্টি" বলে মত (১৩৪৫) দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গত

ঋগবেদ ও ইদিপাসে ধাঁধার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৭১]। বাংলা লোকসাহিত্যের কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শহীদুল্লাহ্‌র পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য। তাঁর মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ; তবে এর রচয়িতা নিয়ে তাঁর বক্তব্যে (১৩৪৫), "ডাক কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধককে ডাক বলিত। ...খনার অর্থ খাঁদা। বচনগুলি খনার নামে আরোপিত হইয়াছে" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৬৮-৬৯] বলে দাবি করে শহীদুল্লাহ্ জানান [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫৮ : ১০-১১ এবং আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ১৯৯৫ : ১১]।–

> ডাক বৌদ্ধদের জ্ঞানী পুরুষ। তাহার স্ত্রীলিঙ্গ ডাকিনী। "বৌদ্ধগান ও দোহা"র অন্তর্নিবিষ্ট "ডাকার্ণব" ডাকের বৌদ্ধত্বের প্রমাণ করিতেছে। যেমন বৌদ্ধ সমাজে ডাকের বচনের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ হিন্দু সমাজে খনার বচনের সৃষ্টি হইয়াছিল। খনার বচনগুলি খনা নাম্নী কোন বিদুষীর একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না; সেগুলি বাঙ্গালী গৃহস্থের পুঞ্জীভূত ভূয়োদর্শনের সংক্ষিপ্ত সার। পরবর্ত্তীকালে ডাক ও খনার বচন বলিয়া যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ভাষা হিসাবে তাহা তত প্রাচীন না হইলেও, তাহাদের অনেকেরই কুলজি মুসলমান আমলের পূর্ব্বে পৌছিবে।
>
> এই কালে বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যায় জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় সাহিত্যের চর্চা ছিল। সংস্কৃতির ঐক্যের কারণে এই তিন দেশে লোকসাহিত্য ও ছন্দের ঐক্য দেখা যায়। খনার বচন, ডাকের বচন এবং ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের আদি কাব্য এই কালে রচিত হইয়াছে। তাহার প্রভাব জয়দেবের গীতগোবিন্দে লক্ষিত হয়।

বাংলা লোকসংগীতের প্রতি শহীদুল্লাহ্ একরকম মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন। প্রণয় ও আনন্দের এসব গানের যে শিল্পসৌন্দর্য ও সমান্তরাল তত্ত্বজ্ঞান তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'পল্লী-সাহিত্য' (১৩৩৬) প্রবন্ধে তার জিজ্ঞাস্য [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৩৪] "পল্লীর সাহিত্য-সম্পদের মধ্যে এই গানগুলি অমূল্য রত্নবিশেষ। .... গানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লীর ঘাটে, মাঠে, বাটে ছড়ান রয়েছে। তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শহুরে গানের প্রভাবে সেগুলি এখন বর্ব্বর চাষার গান বলে ভদ্র সমাজে আর বিকায় না। ... মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে .....এই গানটীর সঙ্গে আপনার শহুরে কোন গানের তুলনা হ'তে পারে?" গানের এই উদ্ধৃতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, "কন্যা ক্যানবা কর মন ভারী"....[১৪] গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর ভাষণে (১৩৪৫) তিনি লোকসংগীতের রচয়িতা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। বাংলার প্রচলিত গানকে তিনি বৈষ্ণব পদাবলী ও

রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে তুলনা করতেও দ্বিধা করেন নি [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৫৭০]—

> অসংখ্য গান পল্লীর ঘাটে মাঠে বাটে ছড়াইয়া আছে। চাষী, মাঝী, মাল্লা, ফকীর, বৈরাগী ইহারাই তাহার রচয়িতা। ...এগুলিকে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে দেখা যাইত বৈষ্ণব পদাবলীর পাশে তাহাদেরও একটী সুন্দর স্থান আছে, দেখা যাইত নিরক্ষর মুসলমান কবির মারফতী গান সাধক রামপ্রসাদের পদের স্পর্দ্ধা করতে পারে।

প্রবাদ বাক্যের ভাষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ শহীদুল্লাহ্‌র মনে হয়েছিল এগুলি "সুন্দরীর অলক তিলকের ন্যায়"। উপরন্তু অতীতের "মনস্তত্ত্ব এবং ইতিহাস" অনেক প্রবাদ বাক্যে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন জাতির প্রবাদবাক্যগুলি কখনও কখনও একইভাবে রচিত [আশরাফ সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ৩]।

অন্যদিকে এটাও তিনি মনে করেন যে লোকসাহিত্যের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা বা সাধারণ মানুষের মুখের বুলি টিকে আছে[১৩]। *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*-এর ভূমিকায় (১৯৬৪) শহীদুল্লাহ্‌ মনে করিয়ে দেন যে [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ১৯৯৯ : ঝ]।

> .... ইহা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যিক ভাষা বিরাট জনগণের মুখের ভাষাকে কাড়িয়া লইতে পারে নাই। এইজন্য লোক সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষা অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে, যদিও তাহা সাহিত্যিক ভাষার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই।

লোকসংস্কার সম্পর্কেও শহীদুল্লাহ্‌র নিজস্ব ভাবনা ছিল। "নৃতত্ত্বের ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের আলোচনায় এই সংস্কারগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশী" বলে তিনি মনে করতেন। লোকসংস্কার সম্পর্কে ঐ নিবন্ধে (১৩৬৬) তিনি মনে করিয়ে দেন যে [মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ১৩৬৬ : ২৪১] "বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। এগুলি যে কত প্রাচীন , না গ'ণে বলা কঠিন"।

এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে বেশ কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করেন —

ক. পেঁচার ডাককে আজও বোধ হয় অজ্ঞ জনসাধারণ অশুভ বলে মনে করে। আমরা বলি এটা কুসংস্কার। তবুও গভীর রাত্রে পেঁচার ডাক শুনলে মনটা কেমন ছ্যাঁক করে ওঠে। এই যে সংস্কার বা কুসংস্কার কত কালের? আমরা ঋগ্‌বেদে দেখতে পাই.... ঋষি পেঁচার ডাককে মৃত্যুর লক্ষণ মনে করেছেন। ... ঋগ্‌বেদের উল্লেখ থেকে বুঝলুম অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর আগেও লোক পেঁচাকে যমের দূত বলে মনে করত।

খ চাঁদের কলঙ্ক সম্বন্ধে পুরাণে নানা কথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, এক বুড়ী বটতলায় বসে চরকায় সুতো কাটছে।

গ জীবজন্তু সম্বন্ধে অনেক সংস্কার আগেকার লোকদের ছিল। বাঘ ও বিড়াল দেখতে প্রায় একরূপ। তাই তারা মনে করত, বিড়াল বাঘের মাসী। বাঘিনী আঁতুড় হ'লে বিড়াল মানুষের বাড়ীতে আগুন নিতে এসেছিল। মাছের কাঁটাকুটা খেয়ে সে এমন ভুলে গেল যে, মানুষের বাড়ীতেই রয়ে গেল।

ঘ খনার জিব কেটে বরাহ লুকিয়ে রেখেছিলেন। টিকটিকি তাই খেয়ে ফেলে। সেই থেকে সে দৈবজ্ঞ হয়ে গেছে। ...কথা বলার সময় টিকটিকি ডাকলে, লোকে বলে 'ঠিক, ঠিক'। সে যেন কথার সায় দেয়।

ঙ বাংলা লোকবিশ্বাসে ঘুঘু দুর্ভাগ্যের প্রতীক। ইংরেজরা বিশ্বাস করে কোনো গৃহের ওপর ঘুঘু বসা মৃত্যু-সংবাদ বহন করে। গ্রিকরাও ঘুঘুকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক বা evil বলে মনে করে।

উপসংহারে ফোকলোর ও লোকসাহিত্য অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান আমরা নিম্নোক্তভাবে অবলোকন করতে পারি :

ক. ফোকলোর ও লোকসাহিত্য অধ্যয়ন-বিশ্লেষণে শহীদুল্লাহ্ একটি সামগ্রিক বিবেচনার পক্ষপাতী ছিলেন; এ ধারার (genre) বিভিন্ন উপকরণকে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে এবং পরস্পর সম্পর্কিতরূপে বিবেচনা করতেন।

খ. ১৯৪০-এর দশক থেকেই শহীদুল্লাহ্ আন্তর্জাতিক ফোকলোর-চর্চা ও ফোকলোর সমিতিগুলোর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

গ. পূর্ব বাংলার লোকসাহিত্য ও ফোকলোরের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহে তিনি উদ্যোগী ছিলেন, অন্যদেরকেও উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে উৎসাহিত করেছেন এবং সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার প্রবক্তা ছিলেন।

ঘ. লোকসাহিত্যের উপকরণ বিশ্লেষণে তিনি অভ্যন্তরীণ প্রমাণে অধিকতর আস্থা রাখতেন।

ঙ. ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠ ধর্মাচারী হলেও ফোকলোরের বিবেচনার ক্ষেত্রে তিনি ধর্মীয়-সংস্কারমুক্ত ও উদার মানসিকতার অনুসারী।

চ. মূলত ভাষা ও সাহিত্যের মানুষ হলেও ফোকলোর-বিবেচনার ক্ষেত্রে শহীদুল্লাহ্ ইতিহাস, নৃ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ছ. তাঁর ফোকলোর-চর্চার একটি প্রধান দিক বাংলার লোকসাহিত্য ও ফোকলোরের নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক উৎস ও বিকাশ অনুসন্ধান।

জ. তুলনামূলক ফোকলোর এবং পাঠ-সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত জীবনী তৈরিতে এই মনীষীর প্রচলিত জীবনীসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আ.জা.ম. তকীয়ূল্লাহ্‌র *মুক্তির দিশারী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*।

২. এ-প্রসঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি ছিল "Bar is not for you, come to our University."

৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তি ছিল 'Shahidullah is not a Dhaka-man'। দীনেশ চন্দ্র সেন শহীদুল্লাহকে সেনের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলেছিলেন। দীনেশ সেন অবসর নিলে (১৯৩২) শহীদুল্লাহ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই পদে আবেদনও করেছিলেন; এ পদে তখন অন্য প্রার্থীরা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুশীলকুমার দে ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [ভূঁইয়া ইকবাল ১৯৮৫ : ১৫]

৪. যথাক্রমে বর্তমান সিন্‌ডিকেট ও সিনেট।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন থেকে ২১ জুলাই ১৯৩২-এ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে এক পত্রে লিখেন-

"বাংলার ভাষাতত্ত্ব বিচার সম্বন্ধে আপনার যোগ্যতার প্রশংসা অনাবশ্যক" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৭০০] । ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬-এ অন্য এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেন, "ব্যাকরণখানি সকল দিকেই সম্পূর্ণ হয়েছে– ...। বইখানি আমার এখানকার বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের হাতে দেব – তাঁরা শ্রদ্ধাপূর্বক ব্যবহার করবেন" [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৬৬]।

৬. নজরুলের প্রথম কবিতা ('মুক্তি') প্রকাশিত হয়েছিল মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোজাম্মেল হক সম্পাদিত *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* পত্রিকা-য় শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায়। নজরুল এজন্য সম্পাদকদ্বয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে করাচি থেকে পত্র লিখেছেন। শহীদুল্লাহ্ ৩২ কলেজ স্ট্রীটের বাসস্থান ছাড়ার পর নজরুল প্রকৃতপক্ষে ঐ কক্ষেই বাস শুরু করেন। পরে শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ, ঢাকায় শহীদুল্লাহ্‌র বাসভবনে নজরুলের অবস্থান প্রভৃতিতে দুজনের ঘনিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ [মাহবুবুল হক ২০১০ : ৮, ৯, ২৬, ১১০, ১৩১, ১৩৩]।

৭. এ-উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৫০ সালে নিম্নোক্ত মুদ্রিত পোস্টকার্ড বিলি করেছিলেন:

আমি বাংলার জীবিত ও মৃত মুসলমান সাহিত্যিক ও কবিগণের জীবনী ও রচনা সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছি। আপনি একজন খ্যাতনামা লেখক। আমি আশা করি আপনি আপনার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমাকে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যদি কোনও মৃত লেখক সম্বন্ধে আপনার নিশ্চিত কিছু জানা থাকে তাহা আমাকে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। প্রস্তাবিত পুস্তক আগামী ১৩৫৭ সালে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ : ৬৫১]।

৮. সিলহেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে (১৯৫৩) তার উক্তি:

... নদী যেমন যে খাত দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার মাটির রং এবং স্বাদ কিছু না কিছু পায়। সেইরূপ পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও কিছু প্রকারভেদ

থাকিবে। ... এই Local Colouring কিন্তু সাহিত্যের প্রাণধর্ম যে মানবীয়তা , তাহার বিরোধী নহে বরং তাহারই এক বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি [আনিসুজ্জামান ১৯৯৪ :৫৮৭]।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপকথা সংগ্রহের জন্য সরলা রায় (১৭ আষাঢ় ১৩০০), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখকে চিঠি লিখেছিলেন [দ্র.সনৎকুমার মিত্র ১৪০০: ২৭৭]। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলার ব্রতের চিত্র ও ছড়া-গল্প সংগ্রহের জন্য চিঠি লিখেছিলেন' [দ্র. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৩]।

১১. এ প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ্‌র মত ছিল, "Song Having Hindu mythology should be omitted" [দ্র. সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য ২০০৭ : ২৫৫]।

১২. মৈমনসিংহ গীতিকার পাঠ পরিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সময়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তবে দ্যুশান জিভিটেলের গ্রন্থে এর অনেক গ্রন্থি উন্মোচিত হয়েছে [দ্র. Zbavitel 19...: ....]।

১৩. ১৯৫২ সালে কলকাতা বেতারে লোকসাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনায় সুকুমার সেন এ-মন্তব্য করেছিলেন [দ্র. সুকমার সেন ১৯৫২ : ১৯৩]। ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত *বাংলাদেশের ছড়া* গ্রন্থের ভূমিকায়ও সুকুমার সেন ছড়াকে "শিশু-বেদ" রূপে আখ্যায়িত করেছেন [দ্র. ভবতারণ দত্ত ১৩৭৭ : ......]।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লিখিত গান সম্পর্কে বলেন, ..."গানের এই দুটি চরণ সেই শৈবাল বিদীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা বলিয়া উঠিল" [দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২ : ৭৯২]।

১৫. আঞ্চলিক ভাষার সজীবতা সম্পর্কিত ধারণায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জর্মন পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর একাধিক আলোচনায় তিনি ম্যাক্সমুলারের "The real and natural life of language is in its dialect" উক্তিটি ব্যবহার করেছেন [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৬৫: ঝ]। শহীদুল্লাহ্ লোকসাহিত্যের ভাষাকে মূলত আঞ্চলিক মনে করতেন; "লোকভাষা" শব্দটির পৃথক ব্যবহার তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নদাশংকর রায়, (১৯৮৫)। 'আচার্য শহীদুল্লাহ্', *সমকাল* (আষাঢ় ১৯৮৫), ঢাকা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৯২৩)। '*বাংলার ব্রত*', কলকাতা

আনিসুজ্জামান (সম্), (১৯৯৪)। *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (সম্), (১৯৯৫)। *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (সম্) (১৯৯৫)। *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আশরাফ সিদ্দিকী, ১৯৯৪ (১৯৬৩)। *লোক-সাহিত্য*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৭৩ (১৯৫৪)। *বাংলার লোক-সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা

তকীয়ূল্লাহ আ.জ.ম., (২০০৮) । *মুক্তির দিশারী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

ভবতারণ দত্ত (১৩৭৭) । *বাংলাদেশের ছড়া*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

ভূঁইয়া ইকবাল (১৯৮৫) । *রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহবুবুল হক, (২০১০) । *নজরুল তারিখ অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই, *ভাষা ও সাহিত্য*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৯৫৮ (১৯৫৩) । *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, রেনেসার্স প্রিন্টার্স, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, (১৩৬৬) । 'লোকসংস্কার', *সাহিত্যিকী*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, (১৯৬৫) । *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (সম্), (১৯৬৫) । *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৪০৭) । 'গ্রাম্যসাহিত্য' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা

সনৎকুমার মিত্র, (১৪০০) । 'ছড়া : পর্যালোচনার শতবর্ষ, *লোক সংস্কৃত গবেষণা*' (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০০), কলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৫২) । 'লোকসাহিত্য', *বিচিত্র সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, ইস্ট এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা

সুকুমার সেন (১৯....) । *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ... খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা

সেলিনা হোসেন ও অন্যান্য, (২০০৭) । *একুশের স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Dorson, Richard M. (1973). *Folklore & Folklife,* University of Chicago Press, USA

Muhammad Shahidullah & Muhammad Abdul Hai, (1963). *Traditional Culture in East Pakistan,* University of Dhaka, Dhaka

Suniti Kumar Chatterji (1926). *The Origin and Development of Bengali Language*, University of Calcutta, Calcutta

Zbavtiel, Dusan (19...). *Ballads from Mymensingh*, University of Calcutta, Calcutta